আয্ যুখরুফ

৪৩

নামকরণ

সূরার ৮৫ আয়াতের وَزُخْرُفًا শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে زُخْرُف 'যুখরুফ' শব্দ আছে এটা সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যে যুগে সূরা আল–মু'মিন, হা–মীম আস সাজদা ও আশ্ শূরা নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফেররা যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও তারই একটি বলে মনে হয়। সেই সময় মক্কার কাফেররা সভায় বসে বসে নবীকে (সা) কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতো। তাঁকে হত্যা করার জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিলো। ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে চলছিলো এ সূরায় প্রবলভাবে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় ঐগুলোর অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমাজের যেসব ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিত যুক্তিবাদিতাও আছে তারা সবাই একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, এসব কেমন ধরনের অজ্ঞতা যা আমাদের জাতি চরমভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে আর যে ব্যক্তি এই আবর্ত থেকে আমাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আদাপানি খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগেছে।

বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা চাচ্ছো তোমাদের দুষ্কর্মের ফলে এই কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের কারণে কখনো নবী–রসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল বন্ধ করেননি। বরং যে জালেমরা তাঁর হিদায়াতের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলো তাদেরকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো তিনি তাই করবেন। পরে আরো একটু অগ্রসর হয়ে আয়াত ৪১, ৪৩ ও ৭৯, ৮০তে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাদের শুনিয়ে নবীকে (সা) বলা হয়েছে, 'তুমি জীবিত থাক বা না

থাক এ জালেমদের আমি শাস্তি দেবই। তাছাড়া দুষ্কৃতিকারীদেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক তাহলে আমিও সে ক্ষেত্রে একটি চরম পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এরপর যে ধর্মকে তারা বুকে আঁকড়ে ধরে আছে তা–কি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যেসব যুক্তি–প্রমাণ দেখিয়ে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই যমীন, আসমান এবং এদের নিজেদের ও এদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। এরা একথাও জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যে নিয়ামত রাজি থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই আল্লাহর দেয়া। তারপরও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করার ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকে।

বান্দাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করে তাও আবার মেয়ে সন্তান হিসেবে। অথচ নিজেদের জন্য মেয়ে সন্তানকে লজ্জা ও অপমান বলে মনে করে।

তারা ফেরেশতাদেরকে দেবী মনে করে নিয়েছে। নারীর আকৃতি দিয়ে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। তাদেরকে মেয়েদের কাপড় ও অলংকার পরিধান করায় এবং বলে, এরা সব আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের ইবাদত করা হয়, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা হয় এবং তাদের কাছেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। তারা একথা কি করে জানলো যে ফেরেশতারা নারী?

এসব অজ্ঞতার কারণে সমালোচনা করা হলে তাকদীরের বাহানা পেশ করে এবং বলে, আল্লাহ আমাদের এসব কাজ পসন্দ না করলে আমরা কি করে এসব মূর্তির পূজা করছি। অথচ আল্লাহর পসন্দ–অপসন্দ জানার মাধ্যম তাঁর কিতাব। পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছাধীনে যেসব কাজ হচ্ছে তা তাঁর পসন্দ অপসন্দ অবহিত হওয়ার মাধ্যম নয়। তাঁর ইচ্ছা বা অনুমোদনে শুধু এক মূর্তি পূজাই নয়, চুরি, ব্যভিচার, ডাকাতি, খুন সব কিছুই হচ্ছে। পৃথিবীতে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সবগুলোকেই কি এই যুক্তিতে বৈধ ও ন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হবে?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই শিরকের সপক্ষে তোমাদের কাছে এই ভ্রান্ত যুক্তি–প্রমাণ ছাড়া কি আর কোন প্রমাণ আছে তখন জবাব দেয়, বাপ–দাদার সময় থেকে তো এ কাজ এভাবেই হয়ে আসছে। এদের কাছে যেন কোন ধর্মের ন্যায় ও সত্য হওয়ার জন্য এই যুক্তি–প্রমাণই যথেষ্ট। অথচ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম—যার অধস্তন পুরুষ হওয়ার ওপরেই তাদের গর্ব ও মর্যাদার ভিত্তি—তাঁর বাপ–দাদার ধর্মকে পদাঘাত করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পূর্ব পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যার সপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলিল–প্রমাণ ছিল না। এসব সত্ত্বেও যদি তাদেরকে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণই করতে হয় তাহলেও তো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামকে ছেড়ে এরা নিজেদের চরম জাহেল পূর্ব পুরুষদের বাছাই করলো কেন?

এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর সাথে অন্যরাও উপাসনা লাভের যোগ্য, কোন নবী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন একটি কিতাবও কি কখনো এ শিক্ষা দিয়েছে? এর জবাবে তারা খৃষ্টানদের হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর বেটা হিসেবে মানার ও উপাসনা করাকে এ কাজের দলীল হিসেবে পেশ করে। অথচ কোন নবীর উম্মত শিরক করেছে বা করেনি প্রশ্ন সেটা ছিল না। প্রশ্ন ছিল কোন নবী শিরকের শিক্ষা দিয়েছেন কিনা? কবে ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছিলেন, আমি আল্লাহর পুত্র, তোমরা আমার উপাসনা করো। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাও তাই ছিল। প্রত্যেক নবীর শিক্ষা ছিল আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকের রব আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত মেনে নিতে তাদের মনে দ্বিধা শুধু এ কারণে যে, তাঁর কাছে ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও জাঁকজমক তো মোটেই নেই। তারা বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এখানে কাউকে নবী মনোনীত করতে চাইতেন তাহলে আমাদের দুটি বড় শহরের (মক্কা ও তায়েফ) গণ্য মান্য ব্যক্তিদের কাউকে মনোনীত করতেন। এই যুক্তিতে ফিরাউনও হযরত মূসাকে নগণ্য মনে করে বলেছিলো, আসমানের বাদশা যদি যমীনের বাদশার কাছে (আমার কাছে) কোন দূত পাঠাতেন তাহলে তাকে স্বর্ণের বালা পরিয়ে এবং তার আর্দালী হিসেবে একদল ফেরেশতাসহ পাঠাতেন। এ মিসকীন কোত্থেকে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমিই মর্যাদার অধিকারী। কারণ, মিসরের বাদশাহী আমার এবং এই নীল নদ আমার আজ্ঞাধীনেই প্রবাহিত হচ্ছে। আমার তুলনায় এ ব্যক্তির এমন কি মর্যাদা আছে! এর না আছে ধন-সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

এভাবে কাফেরদের এক একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথার সমালোচনা করা এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সপ্রমাণ জবাব দেয়ার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে, না আল্লাহর কোন সন্তানাদি আছে, না আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে জেনে বুঝে গোমরাহীর পথ অনুসরণকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর সন্তানাদি থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি একাই গোটা বিশ্ব জাহানের খোদা। আর কেউ তাঁর খোদায়ীর গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে শরীক নয়, বরং সবাই তাঁর বান্দা। তাঁর দরবারে শাফায়াত কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজে ন্যায় ও সত্যপন্থী এবং তাদের জন্য করতে পারে যারা পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করেছিলো।

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣
وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ
صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝٦
وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ
بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

হা–মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।[১] প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২] যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে ভরা কিতাব।[৩]

তোমরা সীমালংঘনকারী, শুধু এ কারণে কি আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো পরিত্যাগ করবো?[৪] পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও আমি বার বার নবী পাঠিয়েছি। এমন কখনো ঘটেনি যে তাদের কাছে কোন নবী এসেছে। কিন্তু তাকে বিদ্রূপ করা হয়নি।[৫] যারা এদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উদাহরণ অতীত হয়ে গিয়েছে।[৬]

১. যে বিষয়টির জন্য কুরআন মজীদের শপথ করা হয়েছে তা হচ্ছে এ গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, 'আমি'। আর শপথ করার জন্য কুরআনের যে বৈশিষ্টটি বেছে নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, 'কিতাবুম মুবীন'। কুরআন যে আল্লাহর বাণী এ বৈশিষ্টের জন্য কুরআনেরই শপথ করা স্বতই এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে লোকজন, এই সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান। চোখ মেলে তা দেখো; এর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন

বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর সাহিত্য, এর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী শিক্ষা, সব কিছুই এ সত্যের সাক্ষ্য পেশ করছে যে, আল্লাহ ছাড়া এর রচয়িতা আর কেউ হতে পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, 'আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করো। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক—এ কুরআন অন্য কোন ভাষায় নয়, বরং তোমাদের নিজেদের ভাষায় রচিত হয়েছে। তাই এর যাচাই বাছাই এবং মর্যাদা ও মূল্য নির্ণয় করতে তোমাদের কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এটা যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় হতো তাহলে এই বলে তোমরা ওজর পেশ করতে পারতে যে, এটা আল্লাহর বাণী কিনা তা আমরা কিভাবে পরখ করবো। কারণ, এ বাণী বুঝতেই আমরা অক্ষম। কিন্তু আরবী ভাষার এই কুরআন সম্পর্কে তোমরা এ যুক্তি কি করে পেশ করবে? এর প্রতিটি শব্দ তোমাদের কাছে পরিষ্কার। ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়দিক থেকে এর প্রতিটি বাক্য তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোন আরবী ভাষাভাষীর বাণী হতে পারে কিনা তা নিজেরা বিচার করে দেখো। এই বাণীর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমি এই কিতাবের ভাষা আরবী রেখেছি এই জন্য যে, আমি আরব জাতিকে সম্বোধন করে কথা বলছি। আর তারা কেবল আরবী ভাষার কুরআনই বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করার এই সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ উপেক্ষা করে শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একে আল্লাহর বাণী না বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলে যারা আখ্যায়িত করে তারা বড়ই জুলুম করে। (এই দ্বিতীয় অর্থটি বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার ৪৪ আয়াত ৫৪ নং টীকাসহ)।

২. ام للكتاب অর্থ اصل الكتاب অর্থাৎ সেই কিতাব যেখান থেকে সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহও গৃহীত হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কিতাবকেই كِتَابٌ مَّكْنُوْنٌ (গোপন ও সুরক্ষিত কিতাব) বলা হয়েছে এবং সূরা বুরুজে এ জন্য 'লওহে মাহফুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন ফলক যার লেখা মুছে যেতে পারে না এবং যা সবরকম প্রক্ষেপণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। কুরআন সম্পর্কে ام الكتاب এ লিপিবদ্ধ আছে একথা বলে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে হিদায়াতের জন্য নবী-রসূলদের কাছে বিভিন্ন ভাষায় কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু সব কিতাবে একই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়েছে, একই সত্যকে ন্যায় ও সত্য বলা হয়েছে, ভাল ও মন্দের একই মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, নৈতিকতা ও সভ্যতার একই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব কিতাব যে দীন পেশ করেছে তা সবদিক দিয়ে একই দীন। কারণ, এ দীনের মূল ও উৎস এক, শুধু ভাষা ও বর্ণনা ভংগি ভিন্ন। একই অর্থ যা আল্লাহর কাছে একটি মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তিনি কোন নবী পাঠিয়েছেন এবং পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে সেই অর্থ একটি বিশেষ বাক্যে ও বিশেষ ভাষায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধরা যাক, আল্লাহ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে পয়দা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এই কুরআনকে সেই জাতির ভাষায় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতেন। সেই জাতি এবং দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারেই তাতে বক্তব্য পেশ করা হতো। বাক্যসমূহ ভিন্ন ধাঁচের হতো ভাষাও ভিন্ন হতো, কিন্তু শিক্ষা ও নির্দেশনা মৌলিকভাবে এটাই থাকতো। সেটাও এই কুরআনের মতই কুরআন হতো, যদিও আরবী কুরআন হতো না। সূরা শুআরাতে এই এ বিষয়টিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ الْعٰلَمِيْنَ .... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ وَاِنَّهُ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ (١٩٢-١٩٦)

"এটা রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব.....পরিষ্কার আরবী ভাষায়। আর এটি পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবসমূহেও বিদ্যমান।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ১১৯-১২১)

৩. এ আয়াতাংশের সম্পর্ক ام الكتاب ও كتاب مبين উভয়ের সাথে। অর্থাৎ এটি এক দিকে কুরআনের পরিচয় এবং অন্যদিকে উম্মুল কিতাবেরও পরিচয় যেখান থেকে কুরআন গৃহীত বা উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআনের এই পরিচিতি দানের মাধ্যমে মন-মগজে একথাই বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, কেউ যদি তার অজ্ঞতার কারণে এ কিতাবের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি না করে এবং এর জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত না হয় তাহলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। কেউ যদি এর মর্যাদা খাটো করার প্রয়াস পায় এবং এর বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি অন্বেষণ করে তাহলে সেটা তার নিজের হীনমন্যতা। কেউ একে মর্যাদা না দিলেই এটা মূল্যহীন হতে পারে না এবং কেউ গোপন করতে চাইলেই এর জ্ঞান ও যুক্তি গোপন হতে পারে না। এটা স্বস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং এর রচয়িতার আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব উচ্চে তুলে ধরেছে। তাই কেউ-এর অবমূল্যায়ণ করলে তা কি করে মূল্যহীন হতে পারে। পরে ৪৪ আয়াতে কুরাইশদের বিশেষভাবে এবং আরববাসীদের সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, এভাবে তোমরা যে কিতাবের বিরোধিতা করছো তার নাযিল হওয়াটা তোমাদের মর্যাদা লাভের একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। তোমরা যদি এই সুযোগ হাতছাড়া করো তাহলে তোমাদের আল্লাহর কাছে কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। (দেখুন, টীকা ৩৯)

৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ঘোষণার সময় থেকে এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়া পর্যন্ত বিগত কয়েক বছরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পুরো কাহিনী এই আয়াতাংশে একত্রে বিবৃত করা হয়েছে। আয়াতাংশটি আমাদের সামনে এই চিত্রই ফুটিয়ে তোলে যে, একটি জাতি শত শত বছর ধরে চরম অজ্ঞতা, অধপতন ও দুরবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ তার ওপর করুণার দৃষ্টি পড়ছে। তিনি তাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার জন্ম দিচ্ছেন এবং তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর নিজের বাণী পাঠাচ্ছেন। যাতে তারা অলসতা ঝেড়ে জেগে ওঠে, জাহেলী কুসংস্কারের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরম সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে জীবনে চলার সঠিক পথ অবলম্বন করে। কিন্তু সেই জাতির নির্বোধ লোকেরা এবং

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنشَرْنَا بِهِ
بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

তোমরা যদি এসব লোকদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, ঐগুলো সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন।[৭] তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়েছেন এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন।[৮] যাতে তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও।[৯] যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন[১০] এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।[১১] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১২] যিনি তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ এবং জীব-জন্তুকে সওয়ারী বানিয়েছেন যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো এবং পিঠের ওপর বসার সময় তোমাদের রবের ইহসান স্মরণ করে বলো ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এদের আয়ত্বে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।[১৩] এক দিন আমাদের রবের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।[১৪]

(এসব কিছু জানা এবং মানার পরেও) এসব লোক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোন কোন বান্দাকে তাঁর অংশ বানিয়ে দিয়েছে।[১৫] প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

তার স্বার্থপর গোত্রপতিরা সেই নেতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগছে এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। যতই বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে তাদের দুষ্কর্ম ততই বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে, তোমাদের এই অযোগ্যতার কারণে কি আমি তোমাদের সংস্কার ও সংশোধনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করবো? উপদেশ দানের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করবো? এবং শত শত বছর ধরে তোমরা যে অধপতনের মধ্যে পড়ে আছ সেই অধপতনের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেব? তোমাদের কাছে আমার রহমতের দাবি কি এটাই হওয়া উচিত? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা এবং ন্যায় ও সত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বাতিলকে আঁকড়ে থাকা তোমাদের কেমন পরিণতির সম্মুখীন করবে?

৫. অর্থাৎ এই নিরর্থক ও অযৌক্তিক কাজকর্ম যদি নবী এবং কিতাব প্রেরণের পথে প্রতিবন্ধক হতো তাহলে কোন জাতির কাছে কোন নবী আসতো না এবং কোন কিতাবও পাঠানো হতো না।

৬. অর্থাৎ বিশিষ্ট লোকদের অযৌক্তিক আচরণের ফলে গোটা মানব জাতিকে নবুওয়াত ও কিতাবের পথ নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করা হবে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। বরং সর্বদাই এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারাই বাতিল পরস্তির নেশায় এবং নিজেদের শক্তির গর্বে উন্মত্ত হয়ে নবী–রসূলদের বিদ্রূপ ও হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তখন যে শক্তির বলে এই কুরাইশদের ছোট ছোট এসব নেতা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। তাদের চেয়ে হাজার গুণ অধিক শক্তির অধিকারীদেরকে মশামাছির ন্যায় পিষে ফেলা হয়েছে।

৭. অন্যান্য স্থানে তো পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে দোলনা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্য তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটি তার অক্ষের ওপর প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে এবং প্রতি ঘন্টায় ৬৬,৬০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে। এর অভ্যন্তরে রয়েছে এমন আগুন যা পাথরকেও গলিয়ে দেয় এবং আগ্নেয় গিরির আকারে লাভা উদগীরণ করে কখনো কখনো তোমাদেরও তার ভয়াবহতা টের পাইয়ে দেয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাদের স্রষ্টা তাকে এতটা সুশান্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আরামে তার ওপর ঘুমাও অথচ ঝাঁকুনি পর্যন্ত অনুভব করো না। তোমরা তার ওপরে বসবাস করো কিন্তু অনুভব পর্যন্ত করতে পার না এটি মহাশূণ্যে ঝুলন্ত গ্রহ আর তোমরা তাতে পা ওপরে ও মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলছো। তোমরা এর পিঠের ওপরে আরামে ও নিরাপদে চলাফেরা করছো অথচ এ ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নেই যে, তোমরা বন্দুকের গুলীর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ীতে সওয়ার হয়ে আছো। বিনা দ্বিধায় তাকে খনন করছো, তার বুক চিরছো এবং নানাভাবে তার পেট থেকে রিযিক হাসিল করছো অথচ কখনো কখনো ভূমিকম্পের আকারে তার অতি সাধারণ কম্পনও তোমাদের জানিয়ে দেয় এটা কত ভয়ংকর দৈত্য যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪–৭৫)।

৮. ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ের মাঝে গিরিপথ এবং পাহাড়ী ও সমতল ভূমি অঞ্চলে নদী হচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক পথ যা আল্লাহ তৈরী করেছেন। এসব পথ ধরেই মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পর্বত শ্রেণীকে যদি কোন ফাঁক ছাড়া একেবারে নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মত করে দাঁড় করানো হতো এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোন সমুদ্র, নদী-নালা না থাকতো তাহলে মানুষ যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলো সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়তো। আল্লাহ আরো অনুগ্রহ করেছেন এই যে, তিনি গোটা ভূ-ভাগকে একই রকম করে সৃষ্টি করেননি, বরং তাতে নানা রকমের এমন সব পার্থক্য সূচক চিহ্ন (Land marks) রেখে দিয়েছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন এলাকা চিনতে পারে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। এটা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার সাহায্যে পৃথিবীতে মানুষের চলাচল সহজ সাধ্য হয়েছে। মানুষের যখন বিশাল কোন মরুভূমিতে যাওয়ার সুযোগ হয়, যেখানে মাইলের পর মাইল এলাকায় কোন পার্থক্যসূচক চিহ্ন থাকে না। এবং মানুষ বুঝতে পারে না সে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছেছে এবং সামনে কোন দিকে যেতে হবে তখন সে এই নিয়ামতের মর্যাদা বুঝতে পারে।

৯. এ আয়াতাংশ একই সাথে দুটি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি হচ্ছে, এসব প্রাকৃতিক রাস্তা ও রাস্তার চিহ্নসমূহের সাহায্যে তোমরা তোমাদের পথ চিনে নিতে পার এবং যেখানে যেতে চাও সেখানে পৌছতে পার। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মহিমান্বিত আল্লাহর এসব কারিগরি দেখে হিদায়াত লাভ করতে পার। প্রকৃত সত্য লাভ করতে পার এবং বুঝতে পার যে, পৃথিবীতে আপনা থেকেই এ ব্যবস্থা হয়ে যায়নি, বহু সংখ্যক খোদা মিলেও এ ব্যবস্থা করেনি, বরং মহাজ্ঞানী এক পালনকর্তা আছেন যিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে এসব রাস্তা বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর একেকটি অঞ্চলকে অসংখ্য পন্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দান করেছেন যার সাহায্যে মানুষ এক অঞ্চলকে আরেক অঞ্চল থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

১০. অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির একটা গড় পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যা দীর্ঘকাল প্রতি বছর একইভাবে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম নেই যে কখনো বছরে দুই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হবে আবার কখনো দুইশ' ইঞ্চি হবে। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মওসুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে বর্ষণ করেন সাধারণত তা ব্যাপক মাত্রায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার জন্য উপকারী হয়। এটাও তাঁর জ্ঞান ও কৌশলেরই অংশ যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশকে প্রায় পুরোপুরিই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে পানি ও লতাগুল্ম শূন্য মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছেন এবং অপর কিছু অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন আবার কখনো ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যাতে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি এলাকার জন্য বৃষ্টিপাত ও তা নিয়মিত হওয়া কত বড় নিয়ামত। তাছাড়া একথাও যেন তার স্মরণ থাকে যে, এই ব্যবস্থা অন্য কোন শক্তির নির্দেশনা মোতাবেক চলছে যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। একটি দেশে বৃষ্টিপাতের যে সাধারণ গড় তা পরিবর্তন কিংবা পৃথিবীর ব্যাপক এলাকায় তার বন্টন হারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা, অথবা কোন আগমনোদ্যত তুফানকে রোধ করতে পারা বা কোন বিমুখ বৃষ্টিকে খাতির তোয়াজ করে নিজ দেশের দিকে টেনে আনা এবং বর্ষণে বাধ্য করার সাধ্য কারোর নেই। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, আয়াত ১৯ থেকে ২২ টীকাসহ, আল মু'মিনূন, টীকা ১৭, ১৮)।

১১. এখানে পানির সাহায্যে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিকে এক সাথে দুটি জিনিসের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এক—এ কাজটি যিনি এক মাত্র আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও কুদরত দ্বারা হচ্ছে। আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্য কেহ তাঁর শরীক নয়। দুই—মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন হতে পারে এবং হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৫৩(কে); আল হাজ্জ, টীকা ৭৯; আন নামল টীকা ৭৩; আর রূম; টীকা ২৫, ৩৪ ও ৩৫; সূরা ফাতের, টীকা ১৯, সূরা ইয়াসীন, টীকা ২৯)।

১২. জোড়া অর্থ শুধু মানব জাতির নারী ও পুরুষ এবং জীব–জন্তু ও উদ্ভিদরাজীর নারী–পুরুষে জোড়াই বুঝানো হয়নি, বরং আল্লাহর সৃষ্ট আরো অসংখ্য জিনিসের জোড়া সৃষ্টির বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণে পৃথিবীতে নতুন নতুন জিনিসের উৎপত্তি হয়। যেমন ঃ উপাদানসমূহের মধ্যে কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় এবং কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় না। যেগুলো পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে সেগুলোর মিশ্রণে নানা রকম বস্তুর উদ্ভব ঘটছে। যেমন বিদ্যুত শক্তির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিদ্যুৎ একটি আরেকটির জোড়া। এ দুটির পারস্পরিক আকর্ষণ পৃথিবীতে বিস্ময়কর ও অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ডের কারণ হচ্ছে। এটি এবং এ ধরনের আরো অগণিত জোড়া যা আল্লাহ নানা ধরনের সৃষ্টির মধ্যে পয়দা করেছেন, এদের আকৃতি কাঠামো, এদের পারস্পরিক যোগ্যতা, এদের পারস্পরিক আচরণের বিচিত্র রূপ এবং এদের পারস্পরিক সংযুক্তি থেকে সৃষ্ট ফলাফল নিয়ে যদি মানুষ চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার মন এ সাক্ষ্য না দিয়ে পারবে না যে, এই গোটা বিশ্ব কারখানা কোন একজন মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানবান কারিগরের তৈরী এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এটি চলছে। এর মধ্যে একাধিক খোদার অধিকার থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১৩. অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ শুধু মানুষকে নৌকা ও জাহাজ চালনা এবং সওয়ারীর জন্য সওয়ারী জন্তু ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি এ জন্য দেননি যে, মানুষ খাদ্যের বস্তার মত এগুলোর পিঠে চেপে বসবে এবং যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনি কে তা চিন্তা করবে না। অনুরূপ তিনি আমাদের জন্য বিশাল সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্ভব করেছেন এবং অসংখ্য রকমের জীব–জন্তুর মধ্যে এমন কিছু জীব–জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অধীন হয়ে থাকে। আমরা তাদের পিঠে আরোহণ করে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যাই। যিনি আমাদের এ ক্ষমতা দান করেছেন তিনি কে তা একবারও ভেবে দেখবো না সে জন্য তিনি এসব দেননি। এসব নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া কিন্তু নিয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া মৃত হৃদয়–মন ও অনুভূতিহীন বিবেক–বুদ্ধির আলামত। একটি জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবণ মন ও বিবেক সম্পন্ন মানুষ যখনই এসব সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করবে তখনই তার হৃদয়–মন নিয়ামতের উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতার আবেগে ভরে উঠবে। সে বলে উঠবে, পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমার জন্য এসব জিনিস অনুগত করে দিয়েছেন। পবিত্র এই অর্থে যে, তাঁর সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে অন্য কেউ শরীক নয়। নিজের খোদায়ীর ক্রিয়াকাণ্ড চালাতে তিনি অক্ষম তাই অন্যান্য সাহায্যকারী খোদার প্রয়োজন পড়ে—এই দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবো, এ অবস্থা থেকেও তিনি পবিত্র।

সওয়ারী পিঠে বসার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হতো সেগুলোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সা) যখন সওয়ারীতে বসতেন তখন তিনবার আল্লাহ আকবর বলতেন। তারপর এই আয়াতটি পড়ার পর এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اللهم انى اسئالك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ماترضى ، اللهم هون لنا السفر ، واطولنا البعيد ، اللهم انت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الاهل - اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى اهلنا (مسند احمد ، مسلم ، ابو داود ، نسائى ، دارمى ترمذى)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার এই সফরে আমাকে নেকী, তাকওয়া এবং এমন কাজ করার তাওফীক দান করো যা তোমার পসন্দ। হে আল্লাহ, আমার জন্য সফরকে সহজ এবং দীর্ঘ পথকে সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ তুমিই আমার সফরের সাথী ও আমার অবর্তমানে আমার পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ, সফরে আমাদের সংগী হও এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে পরিবার পরিজনের তত্বাবধান করো।"

হযরত আলী বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে রিকাবে পা রাখলেন এবং সওয়ার হওয়ার পর বললেন ঃ الحمد لله ، سبحان الذى سخرلنا هذا .... তারপর তিনবার الحمد لله ও তিনবার الله اكبر বললেন এবং তারপর বললেন ঃ

سبحانك ، لا اله الا انت ، قد ظلمت نفسى فاغفرلى

"তুমি অতি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

এরপর তিনি হেসে ফেললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি কারণে হাসলেন। তিনি বললেন, বান্দা رَبِّ اغْفِرْلِىْ (হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দাও) বললে আল্লাহর কাছে তা বড়ই পসন্দনীয় হয়। তিনি বলেনঃ আমার এই বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া রক্ষাকারী আর কেউ নেই। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি।)

আবু মিজলায নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, 'একবার আমি সওয়ারী জন্তুর পিঠে উঠে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا আয়াতটি পড়লাম। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ তোমাদের কি এরূপ করতে বলা হয়েছে! আমি বললাম ঃ তা হলে আমরা কি বলবো? তিনি বললেন ঃ এভাবে বলো ঃ সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। তার শোকর যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর শোকর যে, তিনি তাঁর

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। অথচ অবস্থা এই যে, এসব লোক সেই দয়াময় আল্লাহর সাথে যে ধরনের সন্তানকে সম্পর্কিত করে এদের নিজেদের কাউকে যদি সেই সন্তানের জন্মলাভের সুসংবাদ দেয়া হয় তাহলে তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।[১৬] আল্লাহর ভাগে কি সেই সব সন্তান যারা অলঙ্কারাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং বিতর্ক ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করতেও পারে না?[১৭]

এরা ফেরেশতাদেরকে—যারা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা[১৮] স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। এরা কি তাদের দৈহিক গঠন দেখেছে?[১৯] এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

মাখলুকের জন্য সৃষ্ট সর্বোত্তম উম্মতের মধ্যে শামিল করেছেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করো (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন-জাসসাস)।

১৪. অর্থাৎ প্রতিটি সফরে যাওয়ার সময় স্মরণ করো যে, সামনে আরো একটি বড় সফর আছে এবং সেটিই শেষ সফর। তাছাড়া প্রত্যেকটি সওয়ারী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাও যেহেতু থাকে যে, হয়তো বা কোন দুর্ঘটনা এ সফরকেই তার শেষ সফর বানিয়ে দেবে। তাই উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেকবারই সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে স্মরণ করে যাত্রা করবে। যাতে মরতে হলেও একেবারে অবচেতনার মৃত্যু যেন না হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে এই শিক্ষার নৈতিক ফলাফল ও কিছুটা অনুমান করুন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, ব্যক্তি কোন সওয়ারীতে আরোহণের সময় জেনে বুঝে পূর্ণ অনুভূতির সাথে এভাবে আল্লাহকে এবং তাঁর কাছে নিজের ফিরে যাওয়া ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ করে যাত্রা করে সে কি অগ্রসর হয়ে কোন পাপাচার অথবা জুলুম নির্যাতনে জড়িত হবে? কোন চরিত্রহীনার সাথে সাক্ষাতের জন্য, কিংবা কোন ক্লাবে মদ্য পান বা জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ও কি কোন মানুষের মুখ থেকে একথা

উচ্চারিত হতে পারে অথবা সে তা ভাবতে পারে? কোন শাসক কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী অথবা ব্যবসায়ী যে মনে মনে এসব কথা ভেবে এবং মুখে উচ্চারণ করে বাড়ী থেকে বের হলো সেকি তার গন্তব্যস্থলে পৌছে মানুষের হক নষ্ট করতে পারে? কোন সৈনিক নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটানো এবং দুর্বলদের স্বাধীনতা নস্যাত করার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়ও কি তার বিমানে আরোহণ কিংবা ট্যাংককে পা রাখতে গিয়ে মুখে একথা উচ্চারণ করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে এই একটি মাত্র জিনিস গোনাহর কাজের প্রতিটি তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।

১৫. অংশ বানিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহর কোন বান্দাকে তাঁর সন্তান ঘোষণা করা। কেননা সন্তান অনিবার্যরূপেই পিতার স্বগোত্রীয় এবং তার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলার অর্থ এই যে, তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তায় শরীক করা হচ্ছে। এছাড়াও কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর অংশ বানানোর আরেকটি রূপ হচ্ছে, যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ার শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সেই সব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তাকেও শরীক করা এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা, কিংবা তার সামনে ইবাদত–বন্দেগীর অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা, অথবা তার ঘোষিত হালাল ও হারামকে অবশ্য পালনীয় শরীয়ত মনে করে নেয়া। কারণ, ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে 'উলুহিয়াত' ও 'রবুবিয়াত'কে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং তার একটা অংশ বান্দার হাতে তুলে দেয়।

১৬. এখানে আরবের মুশরিকদের বক্তব্যের অযৌক্তিকতাকে একেবারে উলংগ করে দেয়া হয়েছে। তারা বলতো ঃ ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। তারা মেয়েদের আকৃতি দিয়ে ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলো। এগুলোই ছিলো তাদের দেবী। তাদের পূজা করা হতো। এ কারণে আল্লাহ বলছেন ঃ প্রথমত, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই তোমাদের জন্য এ যমীনকে দোলনা বানিয়েছেন। তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তোমাদের উপকারার্থে তিনিই এসব জীব–জন্তু সৃষ্টি করেছেন, একথা জানা এবং মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। অথচ তোমরা যাদের উপাস্য বানাচ্ছো তারা আল্লাহ নয়, বান্দা। এ ছাড়াও আরো সর্বনাশ করেছে এভাবে যে, কোন কোন বান্দাকে শুধু গুণাবলীতে নয়, আল্লাহর আপন সত্তায়ও শরীক করে ফেলেছে এবং এই আকীদা তৈরী করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তান। তোমরা এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকোনি, বরং আল্লাহর জন্য এমন সন্তান স্থির করেছো যাকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করো। কন্যা সন্তান জন্মলাভ করলে তোমাদের মুখ কালো হয়ে যায়। বড় দুঃখভারাক্রান্ত মনে তা মেনে নাও। এমন কি কোন কোন সময় জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলো। এ ধরনের সন্তান রেখেছো আল্লাহর ভাগে। আর তোমাদের কাছে যে পুত্র সন্তান অহংকারের বস্তু তা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে? এরপরও তোমরা দাবী করো, 'আমরা আল্লাহকে মেনে চলি।'

১৭. অন্য কথায় যারা কোমল, নাজুক ও দুর্বল সন্তান তাদের রেখেছো আল্লাহর অংশে। আর যারা বুক টান করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত সন্তান তাদের রেখেছো নিজের অংশে।

এ আয়াত থেকে নারীদের গহনা ও অলংকারাদি ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ তাদের জন্য গহনা ও অলংকারকে একটি প্রকৃতিগত জিনিস বলে

আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসসমূহ থেকেও একথাটিই প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতে রেশম ও অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এ দুটি জিনিসকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত আবু মূসা আশআরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষেদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লামা আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নীচের বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আয়েশা বলেন, একবার যায়েদ ইবনে হারেসার ছেলে উসামা ইবনে যায়েদ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং রক্ত ঝরতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। তিনি তার রক্ত চুষে থুথু করে ফেলছিলেন এবং তাকে এই বলে সোহাগ করছিলেন যে, উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে অলংকার পরাতাম। উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে ভালভাল কাপড় পরাতাম।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ليس الحرير والذهب حرام على ذكور امتى وحلال لاناثها

"রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণের অলংকার পরিধান আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।"

হযরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার দুজন মহিলা নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলো। তারা স্বর্ণের গহনা পরিহিত ছিল। তিনি তাদের বললেন ঃ এর কারণে আল্লাহ তোমাদের আগুনের চুড়ি পরিধান করান তা কি তোমরা চাও? তারা বললো, না। নবী (সা) বললেন, তাহলে এগুলোর হক আদায় করো অর্থাৎ এর যাকাত দাও।

হযরত আয়েশার উক্তি হচ্ছে, যাকাত আদায় করা হলে অলংকার পরিধানে কোন দোষ নেই।

হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন তোমার শাসন কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে যেসব মুসলিম মহিলা আছে তাদেরকে তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার নির্দেশ দাও।

আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনদের এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর মেয়েদেরকে স্বর্ণের অলংকার পরিয়েছিলেন।

এসব বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর আল্লামা জাসসাস লিখছেন ঃ নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল হওয়ার সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব হাদীস আছে সেগুলো নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকে অধিক মশহুর ও সুস্পষ্ট। উপরোল্লেখিত আয়াতও জায়েয হওয়াই প্রমাণ করছে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগ থেকে আমাদের যুগ (অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ যুগ) পর্যন্ত গোটা উম্মতের কার্যধারাও তাই আছে। এ ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾
وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُم
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

এরা বলে ঃ "দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না।"[২০] এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না, কেবলই অনুমানে কথা বলে। আমি কি এর আগে এদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (নিজেদের এই ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) এরা যার সনদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করছে?[২১] তা নয়, বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাকে একটি পন্থার ওপর পেয়েছি, আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।[২২] এভাবে তোমার পূর্বে আমি যে জনপদেই কোন সতর্ককারীকে পাঠিয়েছি, তাদের স্বচ্ছল লোকেরা একথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি। আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।[২৩] প্রত্যেক নবীই তাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ–দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছো আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তাহলেও কি তোমরা সেই পথেই চলতে থাকবে? তারা সব রসূলকে এই জবাবই দিয়েছে, যে দীনের দিকে আহবান জানানোর জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে মার দিয়েছি এবং দেখে নাও, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

করেনি। এ ধরনের মাসয়ালা সম্পর্কে "আখবারে আহাদের" ভিত্তিতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে না।

১৮. অর্থাৎ পুরুষ বা নারী কোনটাই নয়। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনা আপনি এ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

১৯. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, "এরা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল?"

২০. নিজেদের গোমরাহীর ব্যাপারে এটা ছিল তাদের 'তাকদীর' থেকে প্রমাণ পেশ। এটা অন্যায়কারীদের চিরকালীন অভ্যাস। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, আল্লাহ আমাদের করতে দিয়েছেন বলেই তো ফেরেশতাদের ইবাদত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি যদি না চাইতেন তাহলে আমরা কি করে এ কাজ করতে পারতাম? তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এখানে এ কাজ হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সে জন্য কোন আযাব নাযিল হয়নি। এর অর্থ, আমাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে অপসন্দনীয় নয়।

২১. অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এসব লোক মনে করে পৃথিবীতে যা হচ্ছে তা যেহেতু আল্লাহর অনুমোদনের অধীনে হচ্ছে, তাই এতে আল্লাহর সম্মতি বা স্বীকৃতি আছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি যদি সঠিক হয় তাহলে পৃথিবীতে তো শুধু শিরকই হচ্ছে না, চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার, ঘুষ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যেগুলোকে কোন ব্যক্তিই নেকী ও কল্যাণ মনে করে না। তাছাড়া এ ধরনের যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে কি একথাও বলা যাবে যে, এ কাজ সবই হালাল ও পবিত্র। কারণ, আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে এসব কাজ হতে দিচ্ছেন। আর তিনি যখন এসব হতে দিচ্ছেন তখন অবশ্যই তিনি এসব পসন্দ করেন? পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আল্লাহর পসন্দ অপসন্দ জানার মাধ্যম নয়। বরং এ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যা তাঁর রসূলের মাধ্যমে আসে। আল্লাহ কোন্ ধরনের আকীদা–বিশ্বাস, কাজকর্ম ও চরিত্র পসন্দ করেন এবং কোন্ ধরনের পসন্দ করেন না তা এই কিতাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। অতএব, এসব লোকের কাছে কুরআনের পূর্বে আগত এমন কোন কিতাব যদি বর্তমান থাকে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আমার সাথে ফেরেশতারাও তোমাদের উপাস্য, তাদের ইবাদত করাও তোমাদের উচিত, তাহলে এরা তার প্রমাণ দিক। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৭১, ৭৯, ৮০, ১১০, ১২২, ১২৫; আল আ'রাফ, টীকা ১৬; ইউনুস টীকা ১০১; হূদ, টীকা ১১৬; আর রা'দ, টীকা ৪৫; আন নাহল, টীকা ১০, ৩১, ৯৪; আয যুমার, টীকা ২০; আশ শূরা, টীকা১১)।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের কোন সনদ তাদের কাছে নেই। শুধু এই সনদই আছে যে বাপ–দাদা থেকে এরূপই হয়ে আসছে। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরাও ফেরেশতাদের দেবী বানিয়ে নিয়েছি।

২৩. এটি অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় যে, প্রত্যেক যুগে জাতির সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরাই শুধু নবী–রসূলদের বিরুদ্ধে বাপ–দাদার অন্ধ অনুকরণের ঝাণ্ডাবাহী কেন হয়েছে? ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতায় এরাই অগ্রগামী হয়েছে, এরাই প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় তৎপর থেকেছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত ও

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকূ'

স্মরণ করো সেই সময়টি যখন ইবরাহীম তার বাপ এবং কওমকে বলেছিলো[২৪] "তোমরা যাদের দাসত্ব করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।"[২৫] ইবরাহীম এ কথাটি[২৬] তার পেছনে তার সন্তানদের মধ্যেও রেখে গিয়েছিলো, যাতে তারা এ দিকে ফিরে আসে।[২৭] (এসব সত্ত্বেও যখন এরা অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করলো তখন আমি এদের ধ্বংস করে দিলাম আমি বরং এদের ও এদের বাপ–দাদাদেরকে জীবনোপকরণ দিতে থাকলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত এদের কাছে ন্যায় ও সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এসে গেল।[২৮] কিন্তু ন্যায় ও সত্য যখন এদের কাছে আসলো তখন এরা বললো ঃ এতো যাদু।[২৯] আমরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

উত্তেজিত করে নবী–রসূলদের বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি এরাই করে এসেছে এর কারণ কি? এর মূল কারণ ছিল দুটি। একটি হচ্ছে, সুখী ও সচ্ছল শ্রেণী আপন স্বার্থ উদ্ধার ও তা ভোগ করার নেশায় এমনই ডুবে থাকে যে, তাদের মতে তারা হক ও বাতিলের এই অপ্রাসংগিক বিতর্কে মাথা ঘামানোর জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাদের আরাম প্রিয়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা দীনের ব্যাপারে তাদেরকে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ এবং সাথে সাথে কার্যত রক্ষণশীল (Conservative) বানিয়ে দেয় যাতে প্রতিষ্ঠিত যে অবস্থা পূর্ব থেকেই চলে আসছে হক হোক বা বাতিল হোক—তাই যেন হুবহু প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোন নতুন আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করার কষ্ট না করতে হয়। অপরটি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে তাদের স্বার্থ ওতপ্রোতোভাবে জড়িত থাকে। নবী–রসূল আলাইহিমুস সালামদের পেশকৃত আদর্শ দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই তারা বুঝে নেয় যে, এটা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মাতব্বরির পাটও চুকিয়ে দেবে এবং তাদের হারামখুরী ও হারাম কর্ম করার স্বাধীনতাও থাকবে না। (আরো ব্যখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৯১; আল আ'রাফ, টীকা ৪৬, ৫৩, ৫৮, ৭৪, ৮৮, ৯২; হূদ টীকা ৩১, ৩২, ৪১; বানী ইসরাঈল, টীকা ৮১; আল মু'মিনূন, টীকা ২৬, ২৭, ৩৫, ৫৯; সূরা সাবা, আয়াত ৩৪, টীকা ৫৪)।

২৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১২৪ থেকে ১৩৩; আল আন'আম, টীকা ৫০ থেকে ৫৫; ইবরাহীম, টীকা ৪৬ থেকে ৫২; মার্‌য়াম, টীকা ২৬ ও ২৭; আল আম্বিয়া, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আশ্‌–শুআরা, টীকা ৫০ থেকে ৬২; আল আনকাবূত, টীকা ২৬ ও ৪৬; আস সাফফাত, আয়াত ৮৩ থেকে ১০০, টীকা ৪৪ থেকে ৫৫।

২৫. একথা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ) শুধু তাঁর আকীদা বিশ্বাসই বর্ণনা করেননি, তার সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণও পেশ করেছেন। অন্য সব উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কারণ হচ্ছে, না তারা সৃষ্টি করেছে, না কোন ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশনা দেয় বা দিতে পারে। শুধু লা–শরীক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার কারণ হচ্ছে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দেন এবং দিতে পারেন।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নয়, একথাটা।

২৭. অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে যখনই সামান্য একটু পদস্খলনও ঘটেছে এ বাণী তখনই তার পথনির্দেশনার জন্য সামনে রয়েছে। আর তারাও সেদিকেই ফিরে এসেছে। এখানে এ ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের অযৌক্তিকতাকে পুরোপুরি উলংগ করে দেয়া এবং একথা বলে তাদের লজ্জা দেয়া যে, তোমরা পূর্ব–পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকলেও এ উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম পূর্ব–পুরুষদের বাদ দিয়ে নিজেদের জঘন্যতম পূর্ব–পুরুষদের বেছে নিয়েছো। আরবে যে কারণে কুরাইশদের পৌরোহিত্য চলছিলো তা হচ্ছে, তারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশধর এবং তাঁদের নির্মিত কা'বার তত্বাবধায়ক। তাই কুরাইশদের উচিত ছিল তাঁদের অনুসরণ করা। যারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথ ছেড়ে আশে পাশের মূর্তি পূজারী জাতিসমূহের নিকট থেকে শিরকের শিক্ষা লাভ করেছিলো তাদের অনুসরণ কুরাইশদের জন্য সঠিক ছিল না। এই ঘটনা বর্ণনা করে আরো একটি দিক থেকেও এসব পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে, হক ও বাতিল যাচাই বাছাই না করেই যদি চোখ বন্ধ করে বাপ–দাদার অন্ধ অনুসরণ ঠিক হতো তাহলে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীমই এ কাজ করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর বা–দাদা ও কওমকে পরিষ্কার ভাষায় একথা বলে দিয়েছিলেন, আমি তোমাদের অজ্ঞতা প্রসূত ধর্মের অনুসরণ করতে পারি না যার বিধান অনুসারে তোমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে যারা স্রষ্টা নয় সেই সব সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। এ থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম বাপ–দাদার অন্ধ অনুসরণের সমর্থক নন। বরং তাঁর নীতি ছিল বাপ–দাদার অনুসরণের পূর্বে ব্যক্তিকে চোখ খুলে দেখতে হবে তারা সঠিক পথে আছে কিনা। যদি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা সঠিক পথে চলছে না তখন তাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে যুক্তি অনুসারে যেটা ন্যায় ও সত্যের পথ সেটিই অনুসরণ করতে হবে।

২৮. মূল আয়াতে رسول مبين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এমন রসূল এসেছেন যার রসুল হওয়া সুস্পষ্ট ছিল, যার নবুওয়াত–পূর্ব জীবন ও নবুওয়াত পরবর্তী জীবন স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

তারা বলে, দুটি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুরআন নাযিল করা হলো না কেন?[৩০] *তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বন্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।*[৩১] *(এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।*[৩২] *সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে যদি এই আশংকা না থাকতো তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় ওঠে সেই সিঁড়ি, দরজাসমূহ এবং যে সিংহাসনের ওপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম।*[৩৩] *এগুলো তো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ, তোমার রবের দরবারে আখেরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।*

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুল আম্বিয়া, টীকা ৫ ও সূরা সোয়াদের ব্যাখ্যা, টীকা ৫।

৩০. দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে

চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন। আল্লাহ রসূল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরী চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা–বাণিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয়। মক্কায় কি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না? এটা ছিল তাদের যুক্তি প্রমাণ। কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুরআন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে তাদের এ ধারণা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতিপূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাত আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না। (দেখুন, আন–নাহল, আয়াত ৪৩, বানী ইসরাঈল ৯৪ ও ৯৫; ইউসুফ, ১০৯; আল ফুরকান, ৭ ও ২০; আল আম্বিয়া, ৭ ও ৮ এবং আর রা'দ ৩৮ আয়াত) তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে বললো, বেশতো, মানুষই রাসূল হয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু তাকে তো কোন নামজাদা লোক হতে হবে। তিনি হবেন সম্পদশালী, প্রভাবশালী, বড় দলবলের অধিকারী এবং মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকবে। সে জন্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি করে উপযুক্ত হতে পারেন?

৩১. এটা তাদের আপত্তির জবাব। এ জবাবের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, তোমার রবের রহমত বন্টন করার দায়িত্ব তাদেরকে কবে দেয়া হলো? আল্লাহ তাঁর রহমত কাকে দান করবেন আর কাকে দান করবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি তাদের কাজ? (এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর ব্যাপক রহমত। যে রহমত থেকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করে থাকে)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, নবুওয়াত তো অনেক বড় জিনিস। পৃথিবীতে জীবন যাপন করার যে সাধারণ উপায়–উপকরণ আছে তার বন্টন ব্যবস্থাও আমি নিজের হাতেই রেখেছি, অন্য কারো হাতে তুলে দেইনি। আমি কাউকে সুশ্রী এবং কাউকে কুশ্রী, কাউকে সুকন্ঠের অধিকারী এবং কাউকে অপ্রিয় কন্ঠের অধিকারী, কাউকে শক্তিশালী–সুঠামদেহী এবং কাউকে দুর্বল, কাউকে মেধাবী এবং কাউকে মেধাহীন, কাউকে মজবুত স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং কাউকে স্মৃতিশক্তিহীন, কাউকে সুস্থ অঙ্গ–প্রত্যাঙ্গের অধিকারী, কাউকে বিকলাঙ্গ, অন্ধ অথবা বোবা, কাউকে আমীর পুত্র এবং কাউকে গরীবের পুত্র, কাউকে উন্নত জাতির সদস্য এবং কাউকে পরাধীন অথবা পশ্চাদপদ জাতির সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকি। জন্মগত এই ভাগ্যের ব্যাপারে কেউ সামান্যতম কর্তৃত্বও খাটাতে পারে না। আমি যাকে যা বানিয়েছি সে তাই হতে বাধ্য এবং কারো তাকদীরের ওপর এই ভিন্ন ভিন্ন

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ[৩৪] থেকে গাফিল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়। এ শয়তানরা এসব লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু এরা মনে করে আমরা ঠিক পথেই চলছি। অবশেষে যখন এ ব্যক্তি আমার কাছে পৌঁছবে তখন তার শয়তানকে বলবে ঃ "আহা, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো! তুমি তো জঘন্যতম সাথী প্রমাণিত হয়েছো।" সেই সময় এদের বলা হবে, তোমরা যখন জুলুম করেছো তখন আজ একথা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানরা সমানভাবে আযাব ভোগ করবে।[৩৫]

জন্মগত অবস্থার যে প্রভাবই পড়ে তা পাল্টে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। তাছাড়া আমিই মানুষের মধ্যে রিযিক, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি, সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্ব ইত্যাদি বন্টন করছি। যে আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য লাভ করে কেউ তার মর্যাদাহানি করতে পারে না। আর আমার পক্ষ থেকে যার জন্য দুর্ভাগ্য ও অধপতন এসে যায় কেউ তাকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। আমার সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল কোন কাজেই আসে না। এই বিশ্ব জনীন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব জাহানের অধিপতি কাকে তাঁর নবী বানাবেন আর কাকে বানাবেন না সে ব্যাপারে এসব লোক কি ফায়সালা করতে চায়?

তৃতীয় বিষয়টি হলো, এই খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় একজনকেই সব কিছু অথবা সবাইকে সব কিছু না দেয়ার চিরস্থায়ী একটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। চোখ মেলে দেখো, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বত্র সর্ব ক্ষেত্রে পার্থক্যই নজরে পড়বে। আমি কাউকে

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

হে নবী, তাহলে এখন কি তুমি বধিরদের শোনাবে? নাকি অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের পথ দেখাবে?[৩৬] *আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই কিংবা এদেরকে যে পরিণামের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা তোমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেই এখন তো আমার এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।*[৩৭] *অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে সর্বাবস্থায় তুমি দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে থাকো নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথে আছো।*[৩৮] *প্রকৃত সত্য হলো, এ কিতাব তোমার ও তোমার কওমের জন্য অনেক বড় একটি মর্যাদা এবং এ জন্য অচিরেই তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।*[৩৯] *তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি উপাসনার জন্য রহমান খোদা ছাড়া আর কোন উপাস্য নির্দিষ্ট করেছিলাম কিনা?*[৪০]

কোন জিনিস দিয়ে থাকলে আরেকটি জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি। এবং সেটি অন্য কাউকে দিয়েছি। এমনটি করার ভিত্তি হলো কোন মানুষই যেন অন্য মানুষদের মুখাপেক্ষিতা মুক্ত না হয়। বরং কোন না কোন ব্যাপারে প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে। যাকে আমি নেতৃত্ব ও প্রভাব–প্রতিপত্তি দান করেছি নবুওয়াতও তাকেই দিতে হবে এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান–ধারণা তোমাদের মগজে ঢুকলো কি করে? অনুরূপ তোমরা কি একথাও বলবে যে, একজনের মধ্যেই বুদ্ধি, জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অন্য সব পূর্ণতার সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং যে একটি জিনিসও পায়নি তাকে অন্য কোন জিনিসই দিতে হবে না?

৩২. এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর বিশেষ রহমত, অর্থাৎ নবুওয়াত। এর সারমর্ম হলো, তোমরা নিজেদের যেসব নেতাকে তাদের সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মুরুব্বিয়ানার

কারণে বড় একটা কিছু মনে করছো তা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার সমপর্যায়ের নয়। এ সম্পদ ঐ সম্পদ থেকে অনেক গুণ বেশী উৎকৃষ্ট পর্যায়ের এবং তার উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড অন্য কিছু। তোমরা যদি মনে করে থাকো, তোমাদের প্রত্যেক চৌধুরী আর শেঠই নবী হওয়ার উপযুক্ত তাহলে সেটা তোমাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার পশ্চাদপদতা। আল্লাহর কাছে এ ধরনের অজ্ঞতার আশা করো কেন?

৩৩. অর্থাৎ এই সোনা রূপা যা কারো লাভ করা তোমাদের দৃষ্টিতে চরম নিয়ামত প্রাপ্তি এবং সম্মান ও মর্যাদার চরম শিখরে আরোহণ, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে এতই নগণ্য যে, যদি সমস্ত মানুষের কুফরীর প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশংকা না থাকতো তাহলে তিনি প্রত্যেক কাফেরের বাড়ীঘর সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরী করে দিতেন। এই নিকৃষ্ট বস্তুটি কখন থেকে মানুষের মর্যাদা ও আত্মার পবিত্রতার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই সম্পদ তো এমন সব মানুষের কাছেও আছে যাদের ঘৃণ্য কাজ-কর্মের পংকিলতায় গোটা সমাজ পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। আর একেই তোমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

৩৪. ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। রহমানের 'যিকর' অর্থ তাঁর স্মরণ, তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী এবং কুরআনও।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারীরা শাস্তি পাচ্ছে এতে তোমাদের সান্তনা লাভের কিছুই নেই। কারণ, গোমরাহীর পথে চলার অপরাধে তোমরাও একই শাস্তি লাভ করতে যাচ্ছো।

৩৬. অর্থাৎ যারা শোনার জন্য প্রস্তুত এবং যারা প্রকৃত সত্যের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়নি তাদের প্রতি মনযোগ দাও এবং অন্ধদের দেখানো ও বধিরদের শুনানোর প্রয়াসে প্রাণপাত করো না। কিংবা তোমার এসব ভাই বেরাদর কেন সঠিক পথে আসে না এবং কেনই বা তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানাচ্ছে সেই দুঃখে নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করো না।

৩৭. যে পরিস্থিতিতে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলেই এ কথার তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মক্কার কাফেররা মনে করছিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তাই তাদের জন্য বিপদ হয়ে আছে। মাঝ পথ থেকে এই কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলেই তাদের সব কিছু সুন্দর ও ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন না কোনভাবে তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা রাত দিন বসে বসে পরামর্শ করতো। এতে আল্লাহ তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন ঃ তোমার বর্তমান থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার চোখের সামনেই তাদের দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। আর যদি তোমাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তাহলে তোমার বিদায়ের পরে তাদের দফারফা হবে। অশুভ কর্মফল এখন তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে তাদের পক্ষে রক্ষা পাওয়া আর সম্ভব নয়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّیْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰیٰتِنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا یَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ اِلَّا هِیَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ؗ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৫ রুকূ'

আমি[৪১] মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ[৪২] ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদের বলেছিলো ঃ আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল। অতপর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলো তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে।[৪৩]

৩৮. অর্থাৎ জুলুম ও বে-ঈমানীর সাহায্যে ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতাকারীরা তাদের এই কৃতকর্মের শাস্তি কখন এবং কি পায় তুমি সে চিন্তা করবে না। অথবা তোমার জীবদ্দশায় ইসলাম প্রসার লাভ করে কিংবা করে না, সে চিন্তাও তুমি করবে না। তোমার জন্য সান্তনা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ। অতএব, ফলাফলের চিন্তা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। আর আল্লাহ তোমার সামনেই বাতিলে মাথা অবনত করান না তোমার বিদায়ের পরে করান সেটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

৩৯. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকেই তাঁর কিতাব নাযিলের জন্য বাছাই করছেন এবং কোন জাতির জন্যও এর চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যেই তাঁর নবীকে সৃষ্টি করছেন, তাদের ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করছেন এবং তাদেরকেই গোটা বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বানীবাহক হওয়ার মহা সুযোগ দান করছেন যদি কুরাইশ ও আরববাসীদের এই বিরাট মর্যাদার উপলব্ধি না থেকে থাকে এবং যদি তারা তার অমর্যাদা করতে চায় তাহলে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪০. রসূলদের জিজ্ঞেস করার অর্থ তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জেনে নেয়া। যেমন فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াতাংশের অর্থ "যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের কাছে নিয়ে যাও নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, সে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হও। অনুরূপ রসূলদেরকে জিজ্ঞেস করার অর্থ, যে রসূলগণ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাদের সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো নয়, বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো

আল্লাহর রসূলগণ পৃথিবীতে যেসব শিক্ষা রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখো, মহান আল্লাহ ছাড়া আরো কেউ উপাসনা লাভের যোগ্য তা কেউ শিখিয়েছিলেন কি না।

৪১. এখানে এ ঘটনাটা তিনটি উদ্দেশ্যে বর্ণণা করা হয়েছে। এক—আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আরববাসীদের বর্তমানে একটি সুযোগ দান করেছেন। যখনই আল্লাহ কোন দেশ ও জাতির কাছে তাঁর নবী পাঠিয়ে তাদের এ ধরনের সুযোগ দান করেন কিন্তু সে জাতি তার মর্যাদা ও মূল্য দেয়া এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ফিরাউন ও তার কওম যেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলো তেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করে বসে। তখন তারা এমন পরিণামের সম্মুখীন হয় যা ইতিহাসে শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে আছে। দুই—যেভাবে বর্তমানে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাদের নেতাদের তুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নগণ্য ও হেয় মনে করছে ফিরাউনও তার বাদশাহী, জাঁকজমক, প্রতিপত্তি এবং ধন–সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে ঠিক তেমনি নগণ্য ও হেয় মনে করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন রকম। এবং বাস্তবে হেয় ও নগণ্য কে ছিলো সেই ফায়সালাই শেষ পর্যন্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তিন—আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে বিদ্রূপ করা এবং তাঁর সতর্ক বাণীসমূহের বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা কোন ছোটখাট ব্যাপার নয়, বরং অত্যন্ত চড়া মূল্য দাবি করার মত ব্যাপার। যারা এর পরিণাম ভোগ করেছে তাদের উদাহরণ থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করো তাহলে নিজেও একদিন সেই পরিণাম ভোগ করবে।

৪২. এর অর্থ প্রাথমিক যেসব নিদর্শন নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ লাঠি ও 'ইয়াদে বায়দা' বা আলোকোজ্জ্বল হাত(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৮৭ থেকে ৮৯; ত্বাহা, টীকা ১২, ১৩, ২৯, ৩০; আশ শুআরা, টীকা ২৬ থেকে ২৯; আন নামল, টীকা ১৬; আল কাসাস, টীকা ৪৪ ও ৪৫)।

৪৩. এসব নিদর্শন বলতে বুঝানো হয়েছে সেই নিদর্শনসমূহকে যা আল্লাহ পরবর্তীকালে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদের দেখিয়েছিলেন। নিদর্শনগুলো ছিল ঃ

এক ঃ জন সমক্ষে যাদুকরদের সাথে আল্লাহর নবীর মোকাবিলা হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল 'আরাফ, টীকা ৮৮ থেকে ৯২; ত্বাহা, টীকা ৩০ থেকে ৫০ এবং আশ শুআরা, টীকা ২৯ থেকে ৪০।

দুই ঃ হযরত মূসার ভবিষ্যত বাণী অনুসারে মিসর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং হযরত মূসার দোয়ার কারণেই তা দূরীভূত হয়

তিন ঃ তাঁর ভবিষ্যত বাণীর পর গোটা দেশে ভয়াবহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ বর্ষণসহ প্রবল ঝড়, তুফান আসে, যা জনপদ ও কৃষি ক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলে। এ বিপদও তাঁর দোয়াতেই কেটে যায়।

চার ঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গোটা দেশে পঙ্গপালের ভয়ানক আক্রমণ হয় এবং এ বিপদও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি যতক্ষণ না তিনি তা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

পাঁচ ঃ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী গোটা দেশে উকুন ও কীটাণু ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে একদিকে মানুষ ও জীবজন্তু মারাত্মক কষ্টে পড়ে, অপর দিকে খাদ্য শস্যের গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়। এ আযাব কেবল তখনই দূরীভূত হয় যখন কাকুতি–মিনতি করে হযরত মূসার দ্বারা দোয়া করানো হয়।

ছয় ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পূর্ব–সতর্ক বাণী অনুসারে গোটা দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের সয়লাব আসে যার ফলে গোটা জনপদের প্রায় দমবদ্ধ হওয়ার মত অবস্থা হয়। আল্লাহর এই সৈনিকরাও হযরত মূসার দোয়া ছাড়া ফিরে যায়নি।

সাত ঃ ঠিক তাঁর ঘোষণা মোতাবেক রক্তের আযাব দেখা দেয়। যার ফলে সমস্ত নদীনালা, কূপ, ঝর্ণাসমূহ, দিঘী এবং হাউজের পানি রক্তে পরিণত হয়, মাছ মরে যায়, সর্বত্র পানির আধারে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত মিসরের মানুষ পরিষ্কার পানির জন্য তড়পাতে থাকে। এ বিপদও কেবল তখনই কেটে যায় যখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মূসাকে দিয়ে দোয়া করানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৯৪ থেকে ৯৬; আন নামল, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিন, টীকা ৩৭।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ অধ্যায়েও এ সব আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। তবে তা কল্পকাহিনী ও সত্যের সংমিশ্রণ মাত্র। সেখানে বলা হয়েছে যখন রক্তের আযাব এলো তখন যাদুকররাও অনুরূপ রক্ত তৈরী করে দেখালো। কিন্তু উকুনের আযাব আসলে জবাবে যাদুকররা উকুন সৃষ্টি করতে পারলো না। তারা বললো, এটা আল্লাহর কাজ। এর চেয়েও অধিক মজার ব্যাপার হলো, অসংখ্য ব্যাঙের সয়লাব সৃষ্টি হলে জবাবে যাদুকররাও ব্যাঙের সয়লাব আনলো এবং এরপরও ফেরাউন মূসার কাছেই আবেদন জানালো যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ আযাব দূর করিয়ে দিন। প্রশ্ন হচ্ছে, যাদুকররাও যেখানে ব্যাঙের সয়লাব আনতে সমর্থ ছিল সেখানে ফেরাউন যাদুকরদের দিয়েই এই আযাব দূর করিয়ে নিলো না কেন? তাছাড়া কোনগুলো যাদুকরদের ব্যাঙ আর কোনগুলো আল্লাহর ব্যাঙ তাই বা কি করে বুঝা গেল? রক্ত সম্পর্কেও এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত মূসার সাবধান বাণী অনুসারে যখন সব জায়গার পানির ভাণ্ডার রক্তে পরিণত হয়েছিলো তখন যাদুকররা কোন পানিকে রক্ত বানিয়েছিলো এবং কিভাবে বুঝা গেল অমুক জায়গার পানি যাদুকরদের যাদু বিদ্যা দ্বারা রক্তে পারিণত হয়েছে? এ ধরনের বক্তব্যের কারণে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাইবেল আল্লাহর নির্ভেজাল বাণী সমাহার নয়। বরং যারা তা রচনা করেছে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে অনেক কিছু সংযোজিত করেছে। তবে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ঐ সব রচয়িতারা ছিল নগণ্য জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। কোন কথা সুন্দর করে রচনা করার যোগ্যতা পর্যন্ত তাদের ছিল না।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

প্রত্যেক আযাবের সময় তারা বলতো, হে যাদুকর! তোমার রবের পক্ষ থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছো তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করো। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাবো। কিন্তু আমি যেই মাত্র তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।[৪৪] একদিন ফেরাউন তার কওমের মাঝে ঘোষণা করলো[৪৫] : হে জনগণ, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয় এবং এসব নদী কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না?[৪৬] আমিই উত্তম না এই ব্যক্তি যে হীন ও নগণ্য[৪৭] এবং নিজের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না।[৪৮] তার কাছে সোনার বালা কেন পাঠানো হলো না? অথবা তার আরদালী হিসেবে একদল ফেরেশতা কেন আসলো না?[৪৯]

সে তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।[৫০] অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, তাঁদের সবাইকে এক সাথে ডুবিয়ে মারলাম বেং পরবর্তীদের জন্য অগ্রবর্তী ও শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দিলাম।[৫১]

৪৪. ফেরাউন ও তার কওমের নেতাদের হঠকারিতার মাত্রা পরিমাপ করা যায় এভাবে যে, যখন তারা আল্লাহর আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মূসাকে দিয়ে দোয়া করাতে চাইতো তখনও তারা তাঁকে নবী বলে সম্বোধন না করে যাদুকর বলেই সম্বোধন করতো। অথচ যাদুর তাৎপর্য তারা জানতো না, তা নয়। তাছাড়া একথাও তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, এসব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড কোন প্রকার যাদুর সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে না। একজন যাদুকর বড় জোর যা করতে পারে তা হচ্ছে, একটি সীমিত পরিসরে যেসব মানুষ তার সামনে বর্তমান থাকে সে তাদের মন–মস্তিষ্কের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে তারা মনে করতে থাকে, পানি রক্তে পরিণত হয়েছে, অথবা ব্যাঙ উপচে পড়ছে কিংবা পঙ্গপালের ঝাঁক ক্রমে এগিয়ে আসছে। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেও পানি বাস্তবিকই রক্তে পরিণত হবে না। বরং ঐ পরিসর থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই পানি পানিতে পরিণত হবে। বাস্তবে কোন ব্যাঙ সৃষ্টি হবে না। আপনি যদি সেটিকে ধরে ঐ গণ্ডির বাইরে নিয়ে যান তাহলে আপনার হাতে ব্যাঙের বদলে থাকবে শুধু বাতাস। পঙ্গপালের ঝাকও হবে শুধু মনের কল্পনা। তা কোন ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করতে পারবে না। এখন কথা হলো, একটা গোটা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া, কিংবা সমগ্র দেশের নদী–নালা, ঝর্ণা এবং কূপসমূহ রক্তে পরিপূর্ণ হওয়া অথবা হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে পঙ্গপালের আক্রমণ হওয়া এবং লাখ লাখ একর জমির ফসল ধ্বংস করা। আজ পর্যন্ত কখনো কোন যাদুকর এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি এবং যাদুর জোরে কখনো তা সম্ভবও নয়। কোন রাজা–বাদশাহর কাছে এমন কোন যাদুকর থাকলে তার সেনাবাহিনী রাখার এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সহ্য করার প্রয়োজনই হতো না। যাদুর জোরেই সে গোটা দুনিয়াকে পদানত করতে পারতো। যাদুকরদের এমন শক্তি থাকলে তারা কি রাজা–বাদশাহদের অধীনে চাকরি করতো? তারা নিজেরাই কি বাদশাহ হয়ে বসতো না?

মুফাসসিরগণ এখানে সাধারণভাবে একটি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। অর্থাৎ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরাউন ও তার সভাসদরা হযরত মূসার কাছে যখন দোয়ার জন্য আবেদন করতো তখনো তারা তাঁকে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করতো কি করে? বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনাকারী তো তোষামোদ করে থাকে, নিন্দাবাদ নয়। এ কারণে তারা এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সে যুগে মিসরবাসীদের দৃষ্টিতে যাদু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যা ছিল। 'হে যাদুকর' বলে তারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসার নিন্দাবাদ করতো না, বরং তাদের মতে যেন সম্মানের সাথে তাকে 'হে জ্ঞানী' বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পুরোপুরিই ভুল। কারণ কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেখানেই ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে যাদুকর এবং তাঁর পেশকৃত মু'জিযাসমূহকে যাদু বলে আখ্যায়িত করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে সেখানেই নিন্দাবাদ ও হেয়ো প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্পষ্ট বুঝা গেছে, তাদের কাছে যাদু ছিল একটি মিথ্যা জিনিস। আর এ কারণেই তারা হযরত মূসার বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ আরোপ করে তাঁকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে আখ্যায়িত করতো। তাই এ ক্ষেত্রে 'যাদুকর' কথাটি হঠাত করে তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত আলেম বা বিদ্বানের উপাধি হয়ে যাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হলো, দোয়ার জন্য আবেদন জানানোর সময়ও যখন তারা প্রকাশ্যে হযরত মূসার অমর্যাদা করতো তখন তিনি তাদের আবেদন গ্রহণই বা করতেন কেন? এর জবাব হচ্ছে,

হযরত মূসার লক্ষ্য ছিল আল্লাহর নির্দেশে ঐ সব লোকদের কাছে 'ইতমামে হুজ্জত' বা যুক্তি–প্রমাণের চূড়ান্ত করা। আযাব দূরীভূত করার জন্য তাঁর কাছে তাদের দোয়ার আবেদন করাই প্রমাণ করছিলো যে, আযাব কেন আসছে কোথা থেকে আসছে এবং কে তা দূর করতে পারে মনে মনে তারা তা উপলব্ধি করে ফেলেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তারা হঠকারিতা করে তাঁকে যাদুকর বলতো এবং আযাব কেটে যাওয়ার পর সঠিক পথ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো তখন মূলত তারা আল্লাহর নবীর কোন ক্ষতি করতো না। বরং নিজেদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাকে আরো বেশী জোরালো করে তুলতো। আর আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিয়েছিলেন তাদের পুরোপুরি মূলোৎপাটন করার মাধ্যমে। তাঁকে তাদের যাদুকর বলার অর্থ এ নয় যে, তারা সত্যিই মন থেকেও বিশ্বাস করতো, তাদের ওপর যেসব আযাব আসছে তা যাদুর জোরেই আসছে। তারা মনে মনে ঠিকই উপলব্ধি করতো যে এগুলো সবই বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর নিদর্শন। কিন্তু জেনে শুনেও তা অস্বীকার করতো। সূরা নামলে এ কথাটিই বলা হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (ايت ١٤)

"তারা মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। কিন্তু জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এসব নিদর্শন অস্বীকার করতো।"

৪৫. গোটা জাতির মধ্যে ঘোষণার বাস্তব রূপ সম্ভবত এই ছিল যে, ফেরাউন তার দরবারে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও জাতির বড় বড় নেতাদের উদ্দেশ করে যে কথা বলেছিলো ঘোষকদের মাধ্যমে তা গোটা দেশের সমস্ত শহর ও জনপদে প্রচার করা হয়েছিলো। সেই যুগে তাব কাছে তো তোষামুদে প্রেস, নিজের পোষা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেতার ছিল না যে তার মাধ্যমে ঘোষণা করতো।

৪৬. ঘোষণার এই বিষয়বস্তু থেকেই প্রকাশ পায় যে "হিজ ম্যাজেষ্টির" পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একের পর এক মু'জিযা দেখানো দেবতাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নড়বড়ে করে দিয়েছিলো এবং যে তেলেসমাতির মাধ্যমে ফেরাউনদের খান্দান আল্লাহর অবতার সেজে মিসরে তাদের খোদায়ী চালিয়ে যাচ্ছিলো তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এই পরিস্থিতি দেখে ফেরাউন বলে উঠেছিলো ঃ হতভাগারা, এ দেশে কার রাজত্ব চলছে এবং নীল নদ থেকে উৎপন্ন যে সব নদী নালার ওপর তোমাদের গোটা আর্থিক কায়–কারবার নির্ভরশীল তা কার নির্দেশে প্রবাহিত হচ্ছে তা তোমরা চোখে দেখতে পাও না? এসব উন্নয়ন মূলক কাজ তো করেছি আমি এবং আমার খান্দান আর তোমরা ভক্ত অনুরক্ত হচ্ছো এই ফকীরের।

৪৭. অর্থাৎ যার কাছে না আছে অর্থ–সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

৪৮. কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা, বাল্যকাল থেকেই হযরত মূসার (আ) কথায় যে তোতলামি ছিল সে বিষয়েই ফেরাউনের এই আপত্তি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সূরা তোয়াহাতে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে (আ) যে সময় নবুওয়াতের পদ–মর্যাদায় ভূষিত করা হচ্ছিলো তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমার কথার জড়তা দূর করে দিন যাতে মানুষ ভালভাবে আমার কথা বুঝতে পারে। সেই সময়ই তাঁর অন্যান্য প্রার্থনার সাথে এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করা হয়েছিলো (আয়াত ২৭

থেকে ৩৬)। তাছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত মূসার (আ) যে সব বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা তাঁর পূর্ণ মাত্রার সাবলীল ভাষার প্রতি ইংগিত করে। অতএব, ফেরাউনের আপত্তির কারণ তাঁর কথার তোতলামি ছিল না। বরং তার আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, এ ব্যক্তি অজানা কি সব এলোমেলো কথাবার্তা বলে যার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কখনো আমাদের বোধগম্য হয়নি।

৪৯. প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিকে যখন কোন এলাকার শাসন কর্তৃত্ব অথবা অন্য দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নিয়োগ করা হতো তখন বাদশাহর পক্ষ থেকে তাঁকে খেলাত দেয়া হতো যার মধ্যে স্বর্ণ–বলাকা অথবা চুড়িও থাকতো। তার সাথে সিপাই, দণ্ডধারী ও সেবকদের একটি দল থাকতো যাতে তার প্রভাব ও শান শওকত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে বাদশাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট হয়ে আসছে তার জৌলুস ও জাঁকজমক প্রকাশ পায়। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, সত্যিই যদি আসমানের বাদশাহ মূসাকে (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে তাঁর দূত বানিয়ে পাঠাতেন তাহলে সে বাদশাহী খেলাত লাভ করতো এবং তাঁর সাথে ফেরেশতাদের অনেক দল আসতো। এ কেমন কথা যে, একজন নিস্ব ও সহায়–সম্বলহীন মানুষ হাতে একখানা লাঠি নিয়ে এসে বলছে, 'আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল।'

৫০. এই ছোট্ট আয়াতটিতে একটি অনেক বড় সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন দেশে তার স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর চেষ্টা করে এবং সে জন্য প্রকাশ্যে সব রকমের চক্রান্ত করে। সব রকমের প্রতারণা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়। প্রকাশ্যে বিবেক বিক্রির কারবার চালায় এবং যারা বিক্রি হয় না তাদেরকে দ্বিধাহীন চিত্তে পদদলিত করে তখন সে মুখে না বললেও কার্যক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রকৃত পক্ষে সে ঐ দেশের অধিবাসীদেরকে বুদ্ধি–বিবেক, নৈতিকতা ও সাহসিকতার দিক থেকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে এই মত পোষণ করে যে, এসব নির্বোধ, বিবেক–বুদ্ধিহীন ও ভীরু লোকগুলোকে আমি যেদিকে ইচ্ছা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। তার এ প্রচেষ্টা যখন সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা এর অনুগত দাসে পরিণত হয় তখন নিজেদের কাজ দ্বারাই তারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই ঘৃণ্য লোকটি তাদেরকে যা মনে করেছিলো তারা বাস্তবেও তাই। তাদের এই লাঞ্ছনাকর অবস্থায় পতিত হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, তারা মৌলিকভাবে 'ফাসেক'। হক ও বাতিল এবং ইনসাফ ও জুলুম কি তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকে না। সততা, দীনদারী এবং মহত্ব মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত না মিথ্যা, বে–ঈমানী এবং নীচতা মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত তা নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যাথা থাকে না। এসব বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থই তাদের কাছে আসল গুরুত্বের বিষয়। সে জন্য তারা যে কোন জালেমকে সহযোগিতা করতে, যে কোন স্বৈরাচারের সামনে মাথা নত করতে, যে কোন বাতিলকে গ্রহণ করতে এবং সত্যের যে কোন আওয়াজকে দাবিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৫১. অর্থাৎ যারা তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ না করবে এবং তাদের মতই আচরণ করবে তাদের জন্য তারা অগ্রবর্তী আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

৬ রুকূ'

আর যেই মাত্র ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেয়া হলো তোমার কওম হৈ চৈ শুরু করে দিলো এবং বলতে শুরু করলো ঃ আমাদের উপাস্য উৎকৃষ্ট না সে?[৫২] তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য তোমার সামনে এ উদাহরণ পেশ করেছে। সত্য কথা হলো, এরা মানুষই কলহ প্রিয়। ইবনে মারয়াম আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছিলাম।[৫৩] আমি চাইলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি[৫৪] যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে তো কিয়ামতের একটি নিদর্শন।[৫৫] অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মেনে নাও। এটাই সরল-সোজা পথ। শয়তান যেন তা থেকে তোমাদের বিরত না রাখে।[৫৬] সে তো তোমাদের প্রাকশ্য দুশমন।

৫২. ইতিপূর্বে এ সূরার ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের পূর্বে যে রসূলগণ অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি বন্দেগী করার জন্য রহমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনোনীত করেছি কিনা?" মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছিলো তখন এক ব্যক্তি হাদীসসমূহে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা আপত্তি উথাপন করে বললো ঃ কেন খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসাকে খোদার পুত্র মনে করে তার ইবাদত করে কিনা? তাহলে আমাদের উপাস্যের দোষ কি? এতে কাফেরদের সমাবেশে হাসির রোল পড়ে গেল এবং শ্লোগান শুরু হলো, এবার আচ্ছা মত জব্দ হয়েছে, ঠিকমত ধরা হয়েছে। এখন এর জবাব দাও। কিন্তু তাদের এই বাচালতার কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না করে প্রথমে তা পূর্ণ করা হয়েছে

এবং তারপর আপত্তিকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। (প্রকাশ থাকে যে, তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সব সূত্র সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আয়াতটির পূর্বাপর প্রসঙ্গ এবং ঐসব বর্ণনা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার পর আমরা ওপরে যা বর্ণনা করেছি সেটিই আমাদের মতে ঘটনার সঠিক রূপ বলে প্রতিভাত হয়েছে)

৫৩. অসীম ক্ষমতার নমুনা বানানোর অর্থ হযরত ঈসাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করা এবং তাঁকে এমন মু'জিযা দান করা যা না তাঁর পূর্বে কাউকে দেয়া হয়েছিলো না পরে। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃত মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, শুধু অসাধারণ জন্ম এবং এসব বড় বড় মু'জিযার কারণে তাঁকে আল্লাহর দাসত্বের উর্ধে মনে করা এবং আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তাঁর উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। একজন বান্দা হওয়ার চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা তাঁর ছিল না। আমি তাকে আমার নিয়ামতসমূহ দিয়ে অভিসিক্ত করে আমার অসীম ক্ষমতার নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলাম। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪২ থেকে ৪৪; আন নিসা, ১৯০; আল মায়েদা, টীকা ৪০, ৪৬ ও ১২৭; মারয়াম, টীকা ১৫ থেকে ২২; আল আম্বিয়া, টীকা ৮৮ থেকে ৯০; আল মু'মিনূন, টীকা ৪৩)।

৫৪. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে তোমাদের কোন কোন লোককে ফেরেশতা বানিয়ে দেবো।

৫৫. এ আয়াতাংশের অনুবাদ এও হতে পারে যে তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞানের একটি মাধ্যম। এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, "সে" শব্দ দ্বারা কি জিনিস বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বাসারী এবং সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে এর অর্থ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ কিয়ামত আসবে কুরআন মজীদ থেকে মানুষ তা জানতে পারে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। কথার মধ্যে এমন কোন ইংগিত বর্তমান নেই যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে এখানে কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অন্য সব তাফসীরকারগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, এর অর্থ হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম এবং পূর্বাপর প্রসঙ্গের মধ্যে এটাই সঠিক। এরপর প্রশ্ন আসে, তাঁকে কোন্ অর্থে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম বলা হয়েছে? ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, দাহ্হাক, আবুল আলিয়া ও আবু মালেক বলেন, এর অর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় আগমন, যে সম্পর্কে বহু হাদীসে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তিনি দ্বিতীয় বার যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন বুঝা যাবে কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মহাসম্মান সত্ত্বেও একথা মেনে নেয়া কঠিন যে, এ আয়াতে হযরত ঈসার পুনরাগমনকে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে। কেননা, পরের বাক্যই এ অর্থ গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক। তাঁর পুনরাগমন কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে শুধু তাদের জন্য হতে পারে যারা সেই যুগে বর্তমান থাকবে অথবা সেই যুগের পরে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্য তিনি কিভাবে

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ
هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ
إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, বলেছিলো ঃ আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি এবং এ জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছো তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করবো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল-সোজা পথ।[৫৭] কিন্তু (তাঁর এই সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী পরস্পর মতপার্থক্য করলো।[৫৮] যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আযাব।

এখন এসব লোকেরা কি শুধু এ জন্যই অপেক্ষমান যে অকস্মাত এদের ওপর কিয়ামত এসে যাক এবং এরা আদৌ টের না পাক? যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।[৫৯]

কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম হতে পারেন যার কারণে তাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা সঠিক হবে যে, "অতএব তোমরা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না।" অতএব, অন্য কয়েকজন মুফাসসির এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন আমাদের মতে সেটিই সঠিক ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে জন্ম লাভ, মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখি তৈরী করা এবং মৃতকে জীবিত করাকে কিয়ামতের সম্ভাবনার একটি প্রমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য এই যে, যে আল্লাহ বিনা বাপে সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং যে আল্লাহর এক বান্দা মাটির একটি কাঠামোর মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে ও মৃতদের জীবিত করতে পারেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদের ও সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন তা তোমরা অসম্ভব মনে করো কেন?

৫৬. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা থেকে যেন বিরত না রাখে।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ
تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا
تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا
تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ
عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭ রুকূ'

যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল সেই দিন তাদের বলা হবে, "হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখও আজ তোমাদের স্পর্শ করবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা[৬০] জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশী করা হবে।" তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালাসমূহ আনা নেয়া করানো হবে এবং মনের মত ও দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে, "এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।" আর অপরাধীরা তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম একথা কখনো বলেননি যে, আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। তোমরা আমার উপাসনা করো। অন্য সব নবী-রসূল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর দাওয়াত তাই ছিল। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪৫ থেকে ৪৮; আন নিসা, টীকা ২১৩, ২১৭ ও ২১৮; আল মায়েদা, টীকা ১০০, ১৩০; মারয়াম, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوْٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

তারা চিৎকার করে বলবে "হে মালেক।[৬১] তোমার রব আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন তাহলে সেটাই ভাল" সে জবাবে বলবে ঃ "তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে। আমরা তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের কাছে ন্যায় ও সত্য ছিল অপসন্দনীয়।"[৬২]

এ লোকেরা কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?[৬৩] বেশ তো! তাহলে আমিও একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সব কিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে।

এদের বলো, "সত্যিই যদি রহমানের কোন সন্তান থাকতো তাহলে তার সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হতাম আমি।[৬৪] আসমান ও যমীনের শাসনকর্তা আরশের অধিপতি এমন সমস্ত বিষয় থেকে পবিত্র যা এরা তার প্রতি আরোপ করে থাকে। ঠিক আছে, যে দিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে সেই দিন না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে বাতিল ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে এবং নিজেদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।"

৫৮. অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী তাঁকে অস্বীকার করলে বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হলো যে, তাঁর প্রতি অবৈধভাবে জন্মলাভ করার অপবাদ আরোপ করলো এবং নিজেদের ধারণায় তাঁকে শূলি বিদ্ধ করে তবেই ক্ষান্ত হলো। আরেকটি গোষ্ঠী তাঁকে মেনে নিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে লাগামহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে ছাড়লো এবং

একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার বিষয়টি তাদের জন্য এমন জটিলতা সৃষ্টি করলো যার সমাধান করতে করতে তাদের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, টীকা ৩৯, ৪০, ১০১ ও ১৩০)।

৫৯. অন্য কথায় কেবল সেই সব বন্ধুত্ব টিকে থাকবে যা পৃথিবীতে নেকী ও আল্লাভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য সব বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে। আজ যারা গোমরাহী, জুলুম–অত্যাচার এবং গোনাহর কাজে একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী কাল কিয়ামতের দিন তারাই একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে এবং নিজেকে রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই পৃথিবীতেই ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে সক্ষম হয় যে, কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া ধ্বংসাত্মক।

৬০. মূল আয়াতে ازواج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার কোন ব্যক্তির একই পথের পথিক সমমনা ও সহপাঠী বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থই শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মু'মিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

৬১. মালেক অর্থ জাহান্নামের ব্যবস্থাপক। কথার ইংগিত থেকেই এটিই প্রকাশ পাচ্ছে।

৬২. অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ছিলে সত্যের পরিবর্তে কেচ্ছা–কাহিনীর ভক্ত এবং সত্য ছিল তোমাদের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয়। এখন নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতা মূলক পসন্দের পরিণাম দেখে অস্থির হয়ে উঠছো কেন? হতে পারে এটা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাবেরই একটা অংশ। আবার এও হতে পারে যে, "তোমরা এভাবেই এখানে পড়ে থাকবে" পর্যন্তই জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এই দ্বিতীয় বাক্যাংশটা আল্লাহর নিজের কথা। প্রথম ক্ষেত্রে জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের উক্তি "আমি তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম" ঠিক তেমনি যেমন সরকারের কোন বড় কর্মকর্তা সরকারের পক্ষ থেকে বলতে গিয়ে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয় আমাদের সরকার এ কাজ করেছে বা এ নির্দেশ দিয়েছে।

৬৩. কুরাইশ নেতারা তাদের গোপন সভাসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করছিলো এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৬৪. অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে মানতে আমার অস্বীকৃতি এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সন্তান বলে আখ্যায়িত করছো তাদের ইবাদত করতে আমার অস্বীকৃতি কোন জিদ বা হঠকারিতার ভিত্তিতে নয়। আমি যে কারণে তা অস্বীকার করি তা শুধু এই যে, প্রকৃতপক্ষে কেউই আল্লাহর পুত্র বা কন্যা নয়। তোমাদের এই আকীদা–বিশ্বাস সত্য ও বাস্তবতার পরিপন্থী। আল্লাহর সন্তান আছে এটাই যদি বাস্তব হতো তাহলে আমি আল্লাহর এমন বিশ্বাসী বান্দা যে, তোমাদের সবার আগে আমি তাঁর বন্দেগী মেনে নিতাম।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

সেই একজনই আসমানেও আল্লাহ এবং যমীনেও আল্লাহ। তিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী।[৬৫] অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা যার মুঠিতে যমীন ও আসমানসমূহ এবং যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী।[৬৬] তিনিই কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান রাখেন এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[৬৭]

এরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা শাফায়াতের কোন ইখতিয়ার রাখে না। তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করে।[৬৮]

যদি তোমরা এদের জিজ্ঞেস করো, কে এদের সৃষ্টি করেছে তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ।[৬৯] তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে? রসূলের এই কথার শপথ, 'হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না।[৭০]

ঠিক আছে, হে নবী, এদের উপেক্ষা করো এবং বলে দাও, তোমাদের সালাম জানাই।[৭১] অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৬৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা আলাদা নয়, বরং গোটা বিশ্ব জাহানের আল্লাহ একজনই। গোটা বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা তাঁরই জ্ঞান ও কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে এবং সমস্ত সত্য তিনিই জানেন।

৬৬. অর্থাৎ খোদায়ীর ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার থাকবে এবং এই বিশাল বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বে কারো দখল থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর মহান সত্তা অনেক

উর্ধে। নবী হোক বা অলী, ফেরেশতা হোক বা জিন কিংবা রূহ, তারকা হোক বা গ্রহ আসমানে ও যমীনে যারাই আছে সবাই তাঁর বান্দা, দাস ও নির্দেশের অনুগত। খোদায়ীর কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া কিংবা খোদায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

৬৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমরা যাকেই সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক বানাও না কেন মৃত্যুর পর সেই একমাত্র আল্লাহর সাথেই তোমাদের পাল্লা পড়বে। তাঁর আদালতেই তোমাদের সমস্ত কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ ঃ

প্রথম অর্থ হচ্ছে, মানুষ পৃথিবীতে যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা কেউই আল্লাহর কাছে শাফায়াতকারী নয়। তাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট ও দুষ্কর্মশীল তারা নিজেরাই তো সেখানে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে। তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে (না জেনে শুনে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলো তাদের কথা ভিন্ন।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যারা শাফায়াত করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করবে তারাও কেবল সেই সব লোকের জন্যই শাফায়াত করতে পারবে যারা পৃথিবীতে জেনে শুনে (গাফলতিতে ও অজ্ঞান্তে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতি রুষ্ঠ ছিল কিংবা না বুঝে শুনে اشهد ان لا اله الا الله -ও বলতো এবং অন্যান্য উপাস্যদের উপাসনাও করতো এমন কোন ব্যক্তির শাফায়াত না তারা নিজেরা করবে না তা করার অনুমতি পাবে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি বলে, সে যাদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা অবশ্যই শাফায়াতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার রাখে। এবং আল্লাহর কাছে তাদের এমন ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে যে, আকীদা–বিশ্বাস যাই হোক না কেন তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নিতে পারে, তাহলে সে মিথ্যা বলে। আল্লাহর কাছে কারোরই এই মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি কারো জন্য এমন শাফায়াতের দাবী করে সে যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে একথা সত্য হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে সাহস করে এগিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি এরূপ প্রমাণ পেশ করার মত পজিশনে না থাকে—এবং নিশ্চিতভাবেই নেই—তাহলে অযথা শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কিংবা শুধু অনুমান, সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী হয়ে এরূপ একটি আকীদা পোষণ করা একেবারেই অর্থহীন আর এই খেয়ালীপনার ওপর নির্ভর করে নিজেদের পরিণামকে বিপদগ্রস্ত করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

এ আয়াত থেকে আনুসাঙ্গিকভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, এ থেকে জানা যায়, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে জ্ঞানবিহীন সাক্ষ্য দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হলেও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে যে ব্যক্তিই মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করবে আমরা তাকে মুসলমান হিসেবে মেনে নেবো এবং যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট কুফরী করবে ততক্ষণ আমরা তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহর কাছে শুধু সেই ব্যক্তিই ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে যে তার জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা অনুসারে জেনে বুঝে لا اله الا الله বলেছে এবং সে একথা বুঝে যে এভাবে সে কি কি বিষয় অস্বীকার করছে এবং কি কি বিষয় স্বীকার করে নিচ্ছে।

দুই, এ থেকে সাক্ষ আইনের এই সূত্রটিও পাওয়া যায় যে, সাক্ষের জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত। সাক্ষী যে ঘটনার সাক্ষ দান করছে তার যদি সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাক্ষ অর্থহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ফায়সালা থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। তিনি একজন সাক্ষীকে বলেছিলেন ঃ

اذا رايت مثل الشمس فاشهد والافدع (احكام القران للجصاص)

"যদি তুমি নিজ চোখে ঘটনা এমনভাবে দেখে থাকো যেমন সূর্যকে দেখছো তা হলে সাক্ষ দাও। তা না হলে দিও না।"

৬৯. এর দুটি অর্থ। একটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'। অপরটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা কে তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'।

৭০. কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে আরবী ব্যাকরণের অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, وقيله কথাটির মধ্যে واو কোন্ প্রকৃতির এবং ওপরের বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ জিনিসটির সাথে এর সম্পর্ক? তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের সেই সব আলোচনার মধ্যে আমি কোন সন্তোষজনক বিষয় পাইনি। শাহ আবদুল কাদের (র) সাহেবের অনুবাদ থেকে যে ইংগিত পাওয়া যায় সেইটিই আমার কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয় অর্থাৎ এখানে واو 'আতাফ'–এর (বাক্য সংযোজনের জন্য) জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা فَانّٰى يُؤْفَكُوْنَ আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কিত। আর قيله এর সর্বনাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। يٰرَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না) আয়াতাংশ যার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ

"রসূলের এই বাণীর শপথ যে, "হে রব! এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না" কী বিস্ময়কর এদের প্রতারিত হওয়া। এরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, এদের ও এদের উপাস্যদের স্রষ্টাও আল্লাহ। তা সত্ত্বেও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনার জন্য গোঁ ধরে আছে।

রসূলের এই কথাটির শপথ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের এই আচরণ স্পষ্ট প্রমাণ করছিলো যে, তারা প্রকৃতই হঠকারী লোক। কারণ, তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারে তাদের আচরণের অযৌক্তিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের অযৌক্তিক আচরণ শুধু সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে না মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। অন্য কথায় এ শপথের অর্থ হচ্ছে, রসূল অতীব সত্য কথাই বলেছেন। প্রকৃতই এরা মেনে নেয়ার মত লোক নয়।

৭১. অর্থাৎ তাদের রূঢ় কথা এবং ঠাট্টা–বিদ্রূপের কারণে তাদের জন্য বদদোয়া করো না কিংবা তার জবাবে রূঢ় কথা বলো না। বরং সালাম দিয়ে তাদের কাছে থেকে সরে যাও।